অমর একুশে বইমেলার সাহিত্যিক মুখপত্র

www.sharetindinerpotrika.com

সাড়ে তিন দিনের পত্রিকা

অর্ধ-সাপ্তাহিক

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ৩ । বুধবার । ৪ মার্চ ২০২৬ । ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

লোকসাহিত্য সংখ্যা

বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত সাহিত্যের প্রভাব

সাইমন জাকারিয়া

প্রচ্ছদ : লুৎফি রুনা

প্রধান রচনা

বাংলা সাহিত্যের উৎসমূল *চর্যাপদ* থেকে মধ্যযুগের প্রায় সকল নিদর্শন লোকায়ত সাহিত্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আধুনিককালের বাংলা সাহিত্য সে প্রভাব থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্ত হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচার, চিন্তাভাবনা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সর্বত্র লোকায়ত ঐতিহ্যের অনিবার্য মিশেল। নাগরিক জীবনের ভেতরেও লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ পৃথক করার কোনো উপায় প্রত্যক্ষ করা যায় না। আসলে এখানে কোনো নির্দিষ্ট সীমানা নেই, পরিমাপের উপায়ও নেই। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসের সূচনাতে। উপন্যাসের সূচনার বাক্যটি হলো : 'শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে।' এর কয়েকটি বাক্য পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

অনুবাদ | প্রবন্ধ

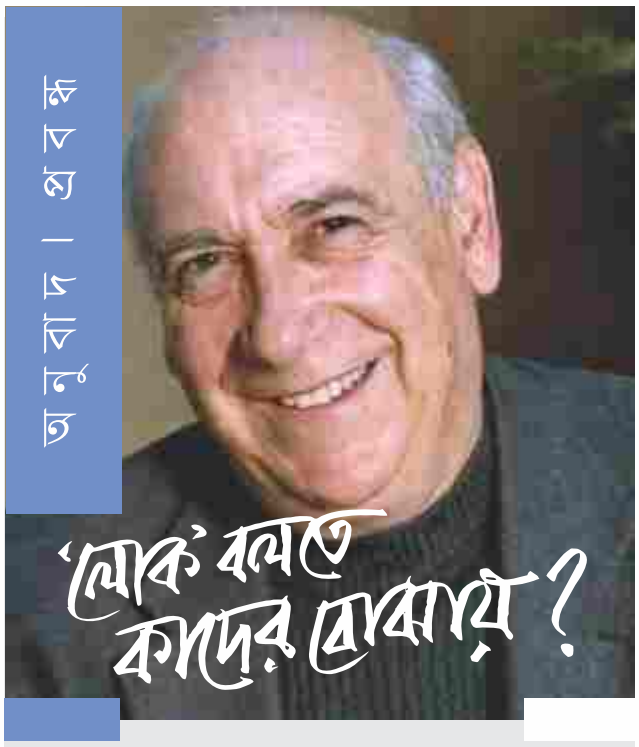

'লোক' বলতে কাদের বোঝায়?

অ্যালান ডান্ডিস

লোক কারা?—এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই ঊনবিংশ শতকের প্রচলিত ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করতে হয়। সেই সময়ে 'folk' শব্দটি ব্যবহার করা হতো প্রধানত ইউরোপীয় কৃষকসমাজ বোঝাতে। লোককে দেখা হতো নিরক্ষর, গ্রামীণ, নিম্নস্তরের জনগোষ্ঠী হিসেবে—যারা শিক্ষিত, নগরভিত্তিক, 'সভ্য' উচ্চবর্গের বিপরীতে অবস্থান করত। সংজ্ঞাটি ছিল—'the illiterate in a literate society' অর্থাৎ লোক ছিল শিক্ষিত সমাজের ভেতরে থাকা অশিক্ষিত অংশ। এই ধারণায় লোক ছিল তুলনামূলক একটি সত্তা—উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গ, শহরের বিপরীতে গ্রাম, সভ্যতার বিপরীতে পশ্চাৎপদতা।

এই সংজ্ঞার একটি বড় সমস্যা ছিল—লোককে স্বাধীন সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে না দেখে তাকে সবসময় অন্য কিছুর প্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা। লোক যেন এক মধ্যবর্তী স্তর: তথাকথিত 'primitive' সমাজের চেয়ে উন্নত, কিন্তু 'civilized elite'-এর চেয়ে নিম্নতর। এই কাঠামো ইউরোপকেন্দ্রিক এবং বিবর্তনবাদী চিন্তার প্রভাবে নির্মিত। এর ফলে লোকসংস্কৃতি বলতে মূলত ইউরোপীয় কৃষকদের ঐতিহ্য বোঝানো হতো। অ-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী, যেমন আমেরিকার আদিবাসী বা আফ্রিকার জাতিগোষ্ঠী, তাদের 'primitive' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো—লোক হিসেবে নয়। একইভাবে নগরসমাজকেও লোকের পরিসরের বাইরে রাখা হতো।

ঊনবিংশ শতকে আরেকটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে লোকসংস্কৃতি মূলত 'survivals'—অতীতের অবশেষ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসব রীতি ও

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

সাক্ষাৎকার

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা

—সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ একজন লেখক এবং লোক গবেষক। প্রবন্ধ ও গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। *নতুন চর্যাপদ* প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এই লোক গবেষক। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার* জন্য তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন **রাজীব চক্রবর্তী**

ফোকলোর নিয়ে আপনার অনেক কাজ রয়েছে। এটি একটি স্বতন্ত্র একাডেমিক শাখা। কিন্তু লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর যা-ই বলা হোক না কেন, এটির একটি সাহিত্যিক দিকও রয়েছে। প্রচলিত সাহিত্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : লোকসাহিত্য একটু আলাদা। তবে শুরুতে প্রচলিত সাহিত্য নিয়েই কথা বলা যাক। বাংলা প্রচলিত

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

১ম পৃষ্ঠার পর

লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির...

সাহিত্য আসলে দুটো আঙ্গিকে বিচার করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিনির্ভর সাহিত্য। এরপর আধুনিক যুগে ছাপাখানানির্ভর সাহিত্য। মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ে সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ লোকমুখে ছিল। যেমন পুঁথিসাহিত্য মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেহেতু লোকমুখে সাহিত্যের প্রচার-প্রসার হয়েছিল, সেহেতু লোকসাহিত্যের সঙ্গে প্রচলিত সাহিত্যের একধরনের যোগ আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, লোকসাহিত্য থেকে বিভিন্ন উপাদান নিয়েই *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* ও *অন্নদামঙ্গল* লেখা হয়েছে।

একই কথা *ময়মনসিংহ গীতিকার* ব্যাপারেও বলা যায়। মধ্যযুগ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিনির্ভর সাহিত্যের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য আর প্রচলিত সাহিত্যের এভাবে একটি সম্পর্ক ছিল। আবার আধুনিক যুগের দিকে তাকালেও কিন্তু আমরা কিছু ধারণা পাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক কবিতায় লোকসাহিত্যের বহু উপাদান ও রসদ আছে। কথাসাহিত্য, ছড়া এমনকি গল্পেও লোকসাহিত্যের বহু উপাদান, অনুষঙ্গ এসেছে। বিশ্বসাহিত্যের বহু ভাষায় দেখা যাবে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়।

লোকসাহিত্যকে বুঝতে হলে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও বুঝতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের শেকড় সেই গ্রামীণ অবকাঠামোতে। জনপদে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে যুগের পর যুগ ধরে প্রচলিত মৌখিক ধারার সাহিত্যই কিন্তু লোকসাহিত্য। এ ধারার সাহিত্য অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন করে। মূলে ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্বতা লাভ করে। এ জন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাই এতে অনুসৃত হয়।

> আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক কবিতায় লোকসাহিত্যের বহু উপাদান ও রসদ আছে। কথাসাহিত্য, ছড়া এমনকি গল্পেও লোকসাহিত্যের বহু উপাদান, অনুষঙ্গ এসেছে। এটা বিশ্বসাহিত্যের বহু ভাষায় দেখা যাবে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়

কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না। সেই আঙ্গিকে লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয়-কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের যে উপাদান, অনুষঙ্গের কথা বলছেন, তা এসেছে কীভাবে?

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : সাহিত্য তো সৃজনের বিষয়। এখানে একজন রচয়িতা আছেন। যিনি সাহিত্য নির্মাণ করছেন, তার জীবন সংস্কৃতির বাইরে নয়। শৈশব থেকে সংস্কৃতিই মানুষকে নির্মাণ করে। অতীতে প্রযুক্তির এতটা বিকাশ হয়নি। তখন আমাদের একধরনের গ্রামীণ সংস্কৃতিতেই বাস করতে হয়েছে।

এখন সময় বদলেছে। প্রযুক্তির এত উন্নয়ন হয়েছে যে মানুষ সহজেই অনেক তথ্য পাচ্ছে। বিনোদনের জন্য তাকে অনেক দূরে যেতে হচ্ছে না। এ বদল আছে।

আমাদের সাহিত্যে এখনও অনেক লেখক বেঁচে আছেন, যাদের শৈশব ও বেড়েওঠা অতীতের এমন এক সময়ে, যখন প্রযুক্তির এতটা বিকাশ ঘটেনি। তারা এখনও সাহিত্যচর্চা করছেন। তাদের লেখায় লোকগাথার অনেক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনটা ভালো দিক। চর্চার জায়গাটা আছে ঠিকই। এ ক্ষেত্রে পাঠকের সচেতনতা বেশি জরুরি।

এখন লোকসাহিত্য মূলত সাহিত্যেরই একটি অংশ। এটাকে আমরা সাহিত্যের বাইরে বিবেচনা করতে পারব না। প্রচলিত সাহিত্যকে যদি ছাপাখানা থেকে ছাপানো বই হিসেবে বিবেচনা করি তবুও তো লোকসাহিত্যকে বাদ দেওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে কি লোকসাহিত্যিক বলে কোনো ধারণা থাকতে পারে?

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : লোকসাহিত্যের তো ওই অর্থে কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতা থাকার কথা নয়। তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লোকসাহিত্যের নানা উপাদানের সঙ্গে এক বা একাধিক রচয়িতার নাম জড়িয়ে আছে। সেটা থাকতে পারে। আছেও। কিন্তু এমনিতে লোকসাহিত্যিক বলে কাউকে চিহ্নিত করা যায় না। বরং আমরা বলি, যারা লোকসাহিত্য বা সংস্কৃতিতে অবদান রেখেছেন, তাঁরা সবাই একটি ধারা অনুসরণ করেছেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইংরেজ কবি জেন টেয়লর লিখেছিলেন—টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার। এ কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা কিন্তু তিনি একটি ঐতিহ্য থেকে নিয়েছিলেন। একইভাবে বাংলা সাহিত্যে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বাংলাদেশে এভাবে গীতিকা, ছড়া, কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাসে লোকসাহিত্যের নানা উপাদান এসেছে। লোকসাহিত্যিক বলে আলাদা কোনো ধারণা না থাকলেও এ ক্ষেত্রে কিন্তু ধারাটিকে আমরা বিবেচনা করতে পারি।

যারা লোকসাহিত্যকে পুনঃসৃষ্টি করছেন তাদেরকেও আমরা লোকসাহিত্যিক বলে অভিহিত করতে পারি ওই অর্থে। এই যেমন বাউলরা আছেন। শাহ আবদুল করিম, বিজয় সরকারের মতো অনেকেই আছেন, যাঁরা আসলে লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে ধরে রেখেছেন এবং সেভাবে পুনঃসৃষ্টি করেছেন। লোকসাহিত্য মূলত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন একটি অঙ্গ হিসেবে থাকবে।

লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি বা লোকগাথা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি একাডেমিক শাখা আছে। আমরা এটিকে ফোকলোর বলি। সাহিত্য বিষয়ক অধ্যয়ন আর ফোকলোর সম্পর্কে এখনও অনেকের জ্ঞান আসলে স্পষ্ট না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার ভাবনা জানতে চাচ্ছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : আসলে ফোকলোর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার নেই। ফোকলোর অনেক আগে থেকেই ছিল। লোকসাহিত্য বা ফোকলোর যে আগে ছিল না এমন তো না। আগেও ছিল। এখন জ্ঞানকাণ্ডের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে এটিকে শনাক্ত করা হয়েছে মাত্র। বাংলা প্রচলিত সাহিত্যের সঙ্গে ফোকলোরকেও গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ভাবার সূচনা বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই। এটা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। এরপর গোটা বিশ্বেই ফোকলোর একটি আলাদা ডিসিপ্লিন হিসেবে চর্চা শুরু করে।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

১ম পৃষ্ঠার পর

'লোক' বলতে...

বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং শিক্ষাবিস্তারের ফলে লোকসংস্কৃতির অবসান ঘটবে—এমন অনুমানও ছিল প্রচলিত।

এই ব্যাখ্যা টেকসই নয়। যদি লোককে কেবল নিরক্ষর কৃষকসমাজে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে আধুনিক শিল্পসমাজে লোকসংস্কৃতির কোনো স্থান থাকবে না। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। আধুনিক সমাজেও অসংখ্য গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাষা, কৌতুক, রীতি ও প্রতীক আছে। সুতরাং লোকের একটি নতুন সংজ্ঞা প্রয়োজন।

লোক বলতে যেকোনো জনগোষ্ঠীকে বোঝানো যায়, যারা অন্তত একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়। সেই বৈশিষ্ট্য হতে পারে পেশা, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল, জাতিগত পরিচয়, শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট বা অন্য কোনো সামাজিক বন্ধন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সে গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু ঐতিহ্য থাকবে, যা তাদের গোষ্ঠী-পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রাখে। ঐতিহ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে—গল্প, কৌতুক, প্রবাদ, রীতি, বিশ্বাস, আচরণধারা, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, যা গোষ্ঠীর ভেতরে প্রচলিত এবং প্রজন্মান্তরে বা সদস্যান্তরে সঞ্চারিত হয়।

লোকগোষ্ঠীর সদস্যরা একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও তারা একটি অভিন্ন ঐতিহ্যগত ভান্ডার ভাগ করে নেয়। প্রত্যেক সদস্যের জ্ঞানের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে আংশিক মিল থাকে। এই আংশিক মিলই গোষ্ঠী-পরিচয়ের ভিত্তি।

এই সংজ্ঞা অনুসারে লোকগোষ্ঠী বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান হতে পারে। একটি জাতি লোক হতে পারে—যেমন একটি দেশের নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত জাতীয় প্রতীক, গান বা প্রবাদ। একইভাবে একটি পরিবারও লোকগোষ্ঠী হতে পারে। পরিবারের ভেতরে প্রচলিত গল্প, ডাকনাম, ব্যক্তিগত ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য, পারিবারিক কৌতুক—সবই পারিবারিক লোকসংস্কৃতির অংশ। আবার পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী—যেমন নাবিক, ব্যাংকার, সংগীতশিল্পী, সৈনিক, বিজ্ঞানী—নিজস্ব কৌতুক, রীতি ও ভাষার মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠী-পরিচয় প্রকাশ করে।

লোকগোষ্ঠীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বহুমাত্রিক সদস্যত্ব। একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক লোকগোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। তিনি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ, একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীর সদস্য, একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধারক এবং একটি পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারেন। ফলে লোকসংস্কৃতি একক নয়; বরং বহুস্তরীয়। ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তি ভিন্ন ঐতিহ্য ব্যবহার করেন। একটি সামরিক কৌতুক ধর্মীয় সভায় বলা উপযুক্ত নাও হতে পারে। এই প্রেক্ষিত-নির্ভরতা লোকসংস্কৃতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

লোকসংস্কৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো ভিন্নতা বা variation. কোনো লোককাহিনি বা কৌতুকের একক, স্থির রূপ থাকে না। একই কাহিনি ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভিন্নভাবে প্রচলিত হতে পারে। লোকসংস্কৃতি তাই স্থির পাঠ নয়, বরং চলমান প্রক্রিয়া।

উনবিংশ শতকের ধারণা ছিল—প্রযুক্তি লোকসংস্কৃতির অবসান ঘটাবে। কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্তি লোকসংস্কৃতির সঞ্চারণকে দ্রুততর করেছে। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, মুদ্রণযন্ত্র—এসব যোগাযোগমাধ্যম লোকরীতি দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তি নিজেই লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী বা কম্পিউটার-প্রোগ্রামারদের নিজস্ব কৌতুক ও নীতিবাক্য আধুনিক লোকসংস্কৃতির উদাহরণ। সুতরাং প্রযুক্তি লোকসংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করেনি; বরং নতুন রূপে প্রসারিত করেছে।

লোককে কেবল নিম্নবর্গে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতাও গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমজীবী গোষ্ঠীর যেমন লোকসংস্কৃতি আছে, তেমনি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত বা পেশাজীবী গোষ্ঠীরও নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। লোকসংস্কৃতি সামাজিক শ্রেণির একচেটিয়া সম্পদ নয়।

অতএব লোককে আর একক, সমজাতীয়, গ্রামীণ গোষ্ঠী হিসেবে কল্পনা করা যায় না। লোক একটি স্বাধীন সামাজিক বাস্তবতা, যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। শিল্পায়ন কৃষিজীবনের সংখ্যা কমাতে পারে, কিন্তু লোকগোষ্ঠীর সংখ্যা কমায় না। বরং নতুন সামাজিক কাঠামো নতুন লোকসংস্কৃতির জন্ম দেয়।

'লোক কারা?'—এই প্রশ্নের উত্তর তাই বিস্তৃত। লোক হলো সেইসব মানুষ, যারা কোনো অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠী গঠন করে এবং একটি ঐতিহ্যগত ভান্ডার ভাগ করে নেয়। এই অর্থে লোক কেবল অতীতের কৃষক নয়; আধুনিক নগরবাসী, পেশাজীবী, ছাত্র, বিজ্ঞানী—সকলেই বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লোকগোষ্ঠীর সদস্য। লোক বিলুপ্ত হচ্ছে না; বরং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আকারে পুনর্গঠিত হচ্ছে।

অ্যালান ডান্ডিস (১৯৩৪—২০০৫) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আমেরিকান লোকসাহিত্যিক (Folklorist) এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, বার্কলের নৃতত্ত্ব ও লোকবিজ্ঞানের অধ্যাপক। লেখাটি লেখকের 'Who Are The Folk?' প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ

ভাষান্তর : আন্দামান বাগচি

১ম পৃষ্ঠার পর

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।' এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার যে, নগরজীবনের আখ্যান রচনার মধ্যেও লোকায়ত সংগীতের সুর ও বাণী আধুনিককালের রবীন্দ্র-উপন্যাসের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

লোকায়ত সাহিত্যের এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের প্রায় কোনো সাহিত্যিক মুক্ত হতে পারেনি। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* যেমন রামায়ণ ও লোকায়ত আখ্যান অবলম্বনে সৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি বঙ্কিম সাহিত্যসম্ভারের *কপালকুণ্ডলা* লোকায়ত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত, মীর মশাররফের *বিষাদ-সিন্ধুর* আখ্যান নির্মিত হয়েছিল লোকায়ত পুঁথিকাব্যের আশ্রয়ে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্য, নজরুলসাহিত্য; এমনকি জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্‌দীনের কাব্যভান্ডার লোকায়ত সাহিত্যের নির্যাসজাত। তবে লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাগত অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে অনেকেই সচেতনভাবে সাহিত্য পাঠ করেন না। তারা নিছক বিনোদন ও সময় কাটানোর অনুষঙ্গ হিসেবেই এটিকে বিচার করেন। এর বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। তবে সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হিসাব আলাদা। সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনার ধরন এমনকি শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগটিও করতে হয়। সম্প্রতি ইন্টারডিসিপ্লিনারি নানা অ্যাপ্রোচ আসায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে লোকসাহিত্য, প্রচলিত সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য নিয়েও আলাদা ধারণা তৈরি হচ্ছে। এটি ভালো দিক। তবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে এসব ধারণা স্পষ্ট নয়। এ ধারণাটি স্পষ্ট করার জন্য সাহিত্য পত্রিকা, প্রবন্ধ সংকলন; এমনকি প্রয়োজনে ভিজ্যুয়াল মিডিয়াকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে...

> লোকায়ত সাহিত্যের এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের প্রায় কোনো সাহিত্যিক মুক্ত হতে পারেনি

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন কাউকেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে লোকায়ত সাহিত্যের প্রভাব নেই। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসের কথা। তিনি সার্থকভাবে লোকায়ত জীবনের গভীর তাৎপর্যময় আখ্যান নির্মাণ করেছেন। যে জীবনের সাথে রাজনৈতিক চেতনার সম্পর্ক রয়েছে। *খোয়াবনামা* উপন্যাসটি মূলত বঙ্গভঙ্গ (১৯৪৭)-এর কিয়ৎকাল পূর্ব এবং পরবর্তী সময়কাল নিয়ে রচিত। এর কাহিনি বিস্তৃতিলাভ করেছে বগুড়া জেলার একটি ক্ষুদ্রাকার ও প্রত্যন্ত জনপদে। অঞ্চলটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিল, যার নাম কাৎলাহার; এবং কাৎলাহার ঘিরে গড়ে উঠেছে গিরিরডাঙা, নিজগিরির ডাঙা, গোলাবাড়ি হাট ইত্যাদি পল্লিসমূহ। এইসব জনপদে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহবিষয়ক বিভিন্ন লোকশ্রুতি, লোককথা, লোকছড়া, প্রবাদ, পুঁথির খণ্ডাংশ এই উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ছাড়া, শওকত আলীর *মাদারডাঙ্গার কথা* উপন্যাস প্রসঙ্গে বলা যায়। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনজীবনের সঙ্গে কীভাবে জাদুবাস্তবতার অপূর্ব বুননে লৌকিক পীরের অলৌকিক আখ্যান, কৃত্যাচার ও উপনিবেশবাদবিরোধী বিপ্লবী চেতনার ইতিহাস মিশ্রিত রয়েছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন এই উপন্যাস। এর কাহিনিটি অনিবার্যভাবে রহস্যঘেরা ও বাস্তব। প্রকৃতির অতিলৌকিক রহস্য মাদারডাঙ্গার লোকমানুষের মানসজাত। তাদের বিশ্বাসের ভেতর মাদার গাছের যেমন একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি সেই গাছের সঙ্গে মাদার পীরের অলৌকিক শক্তির প্রতি সীমাহীন আনুগত্য বা বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনিতে রহস্যঘেরা লোকজীবনের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের ভূমিকা ও অস্তিত্ব রক্ষায় পীর-সংস্কৃতির ভেতর তাদের মিলে-মিশে যাওয়ার প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিককাল পেরিয়ে পাকিস্তানবিরোধী সংগ্রাম হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তার গুপ্ত একটি ইতিহাসকে ধারণ করেছে। এতে গ্রামের ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামে বাঙালি নর-নারীদের পাশাপাশি আদিবাসী নর-নারীর জীবনও যুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া, মাদার পীরের অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসী মানুষেরা মাদার গাছ রক্ষায় যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করেছে, তাতে প্রকৃতির প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় গ্রামের মানুষের সচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

এ উপন্যাসের কাহিনি মূলত লোকায়ত ফকির ও দরবেশদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেছে। কেননা, ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ফকির-দরবেশরা ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি এ দেশের জনগণের সুখ-দুঃখে শরিক হয়ে সর্বকালে পাশে থেকেছেন। এমনকি শাসকদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের সঙ্গে মিলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা অঞ্চলের ফকির বিদ্রোহ তেমনই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পরবর্তীকালে ফকির-দরবেশ নামে পরিচিত এদেশীয় মানুষদের জীবনধারা আর পূর্বের মতো থাকেনি। অধ্যাত্মসাধনের সঙ্গে অনেক লোকবিশ্বাসও মিশ্রিত হয়ে গেছে। তারপর আবার ফকিরালি এবং দরবেশি প্রথা চালু হয়েছে। ফকির-দরবেশদের নিয়ে অনেক কাহিনি ও গল্প এদেশে সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং সেগুলো এখনও গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়। সেইসব গল্প-কাহিনির উপাদান নিয়েই এই উপন্যাস *মাদারডাঙ্গার কথা*। সার্বিক বিচারে উপন্যাসটি লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাবে রচিত।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যেও বিভিন্ন স্তরের লোকায়ত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের কথা। তিনি বাঙালিদের রচিত লোকায়ত সাহিত্যের উপাদান ও লোকায়ত জীবনের অনুষঙ্গ নিয়ে যেমন নাট্যসাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোকায়ত গল্প, পুরাণ ও লোকায়ত জীবননির্ভর বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। যেমন, তাঁর রচিত *একটি মারমা রূপকথা*, *বনপাংশুল* প্রভৃতি নাটকে নৃগোষ্ঠীর জীবন, লোকবিশ্বাস, পুরাণ আখ্যানের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়। এর বাইরেও বহু লেখকের রচনায় লোকায়ত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়, যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

লেখক : নাট্যকার ও লোক গবেষক

পা ণ্ডু লি পি থে কে

বাংলা গানের শতাব্দীব্যাপী যাত্রার ইতিবৃত্ত

প্রসঙ্গের সূত্রপাত হয়েছিল আধুনিক গান নিয়ে গবেষণার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না—এই প্রশ্নকে ঘিরে। সত্যি বলতে 'আধুনিক গান' সংজ্ঞার্থটি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। 'আধুনিক' কথাটি কি 'সমকালীন' অর্থে ব্যবহৃত? যদি তা-ই হয়, তবে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার গানকে আজও কি আধুনিক গান বলা যাবে? ২০২০ বা তৎপরবর্তীকালে প্রকাশিত গানও আধুনিক! সব যুগের সব গানই কি আধুনিক গান? এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায়, গানের শ্রেণিবিন্যাস প্রকৃতপক্ষে দশকনির্ভর নয়—বিষয়বস্তু ও কাঠামোর ভিত্তিতেই নির্ণিত হয় গানের শ্রেণি। স্মর্তব্য, গত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান আধুনিক গান হিসেবেই গণ্য হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে নজরুল নিজেই কোনো কোনো গানের শীর্ষে লিখেছেন 'মডার্ন সং'। কলকাতার আকাশবাণীতে এ ধারার গানকে শুরুতে বেতারে বলা হতো 'কাব্যগীতি'। স্বপন সোম *গানের ভেতর দিয়ে* (২০১৫) বইয়ে জানাচ্ছেন, 'আধুনিক গান' অভিধাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩০ সালে আকাশবাণীতে। অতিসম্প্রতি 'নাগরিক বাংলা গান' বলার প্রচলন বাড়ছে। এতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় : অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক গান নগর বা আধুনিক জীবনের অনুষঙ্গে রচিত।

মূল প্রসঙ্গ—গভীরভাবে ধারণ করার মতো কোনো বোধ, উচ্চতর জীবনজিজ্ঞাসা আধুনিক গানে আছে? এ কি কেবলই 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল?' তা তো বটেই। আধুনিক গান হৃদয়ের কথাই বলতে চায়। কিন্তু যুগ, সমাজ, ব্যক্তিরুচি চিরকাল সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক বাংলা গানও তাই যুগের প্রভাব ও সমাজের চাহিদাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি কখনো। চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, স্বাধীনতা-আন্দোলন, জাতিগত দাঙ্গা ইত্যাদি মিলে দেশ জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা—তার প্রভাব সমকালীন গানে অনিবার্যভাবে পড়েছে। সেসব গান ব্যাকুলভাবে শুধু হৃদয়ের কথাই বলেনি, ক্ষুধার্ত জঠরের কথাও বলেছে। মোহিনী চৌধুরীর কথা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে ১৯৪৫ সালে সত্য চৌধুরী গেয়েছিলেন 'পৃথিবী আমারে চায়'। এ গান সে সময়ে মিলিয়ে দিয়েছিল আধুনিক গান ও গণসংগীতের ভেদরেখা : 'পৃথিবী আমারে চায়/রেখো না বেঁধে আমায়/খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর ॥'

গানটি সলিল চৌধুরীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭৭ সালে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে তিনি রেকর্ড করান অনুরূপ একটি গান : 'আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন প্রেমের/চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয় ॥' মোহিনী চৌধুরীর গানে যে-নায়ক কথা বলছে, সলিল চৌধুরীর গানে নায়িকা দিচ্ছে তার প্রতি-উত্তর। বাহুডোরে বেঁধে না রেখে নায়ককে সে এগিয়ে দিতে চায় মানবতার বৃহত্তর পথে : 'ওগো প্রিয় মোর খোলো বাহুডোর/পৃথিবী তোমারে যে চায় ॥'

মোহিনী চৌধুরীর কথার রেশ এখানেই শেষ হয়নি। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপেন হাজারিকার জন্য লেখেন একই ভাবধারার একটি গান : 'আর ফুল নয় আর মালা নয়/নয় ফাগুনের কাব্য,/মধু-রাত নয় মায়া-চাঁদ নয়/মানুষের কথা ভাবব/শুধু মানুষের কথা ভাবব ॥'

আরেকটু অনুসন্ধান করলে আমরা উপলব্ধি করব, 'পৃথিবী আমারে চায়' গানটির থিম এসেছে কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের *নকশে ফরিয়াদি* (১৯৪৩) কাব্যের একটি কবিতা থেকে : 'মুঝসে পেহলিসি মুহাব্বত মেরে মেহবুব না মাঙ্গ ॥'

পুরো কবিতাটি (পরবর্তীকালে গান হিসেবে গীত) পড়লে এতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলনের বিষয়টিও দৃষ্টি এড়ায় না।

শতবর্ষের সেরা বাংলা গান

গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদনা
আসলাম আহসান

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
ধরন : সংগীত
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস

প্রবন্ধ

আধুনিক শিল্প ও লোকসাহিত্য

মাহমুদুর রহমান

চীনা চলচ্চিত্র নির্মাতা ক্লোয়ি ঝাও একটা সিনেমা বানিয়েছেন। নাম ‘হ্যামনেট’। স্বাভাবিকভাবেই ‘হ্যামলেট’-এর কথা মনে পড়ে। শেক্সপিয়রের ছেলে হ্যামনেট, মাত্র ১১ বছর বয়সে মারা যায়। কিন্তু এই হ্যামলেট আর হ্যামনেটের মাঝে পড়ে থাকে আরেকটা নাম—অ্যামলেথ। বস্তুত যাকে আমরা হ্যামলেট, ‘প্রিন্স অব ডেনমার্ক’ বলে জানি, তার নেপথ্য নায়ক এই অ্যামলেথ। শেক্সপিয়র কালজয়ী সাহিত্যিক তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। তবে তাঁর গল্পের শেকড় নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। বিশেষত ‘হ্যামলেট’ অনেকটাই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রিন্স অ্যামলেথের আদলেই তৈরি। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকসাহিত্য থেকে উপাদান নিয়েছেন ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়র। তেমনই আজকের দিনে প্রশান্ত নীল নির্মিত ‘কেজিএফ’-এও উঠে আসে কর্ণের আদল।

লোকসাহিত্য কী, তা নিয়ে তত্ত্বীয় আলাপ চলতে পারে। তবে সেদিকে যাওয়ার সুযোগ আমার নেই। লোকসাহিত্য নিয়ে লেখার প্রস্তাব পেয়ে মনে হলো কী লেখা যায়। ভাবতে ভাবতেই নীল গেইম্যানের ‘স্যান্ডম্যান’ মনে পড়ে গেল। বই পড়িনি, সিরিজ দেখেছি। সেখানে একটা পর্ব ছিল শেক্সপিয়রকে নিয়ে। তাকে একেবারেই নতুন করে উপস্থাপন করেছেন নীল। আরও দেখা গেল সেখানে, শেক্সপিয়রের তৈরি করা চরিত্র রূপকথার মতো মনে হলেও তারা এসেছিল অন্য দুনিয়া থেকে। বিশেষত মিডসামার নাইটের (আ মিডসামার নাইট’স ড্রিম) পাক তথা রবিন গুডফেলো তো ইংরেজি মিথ থেকেই নেওয়া। নীল তাকে অন্য দুনিয়া বা নর্স মিথের সঙ্গে যুক্ত করলেও শেক্সপিয়র হয়তো নিয়েছিলেন ইংরেজি লোকসাহিত্য থেকে।

কেবল শেক্সপিয়র নাকি! লোকসাহিত্য থেকে প্রভাবিত মিয়াজাকির মতো আধুনিক নির্মাতাও। স্টুডিও জিবুরি থেকে মিয়াজাকি স্বয়ং বানিয়েছেন ‘স্পিরিটেড অ্যাওয়ে’র মতো সিনেমা। দশ বছর বয়সী চিহিরোকে নিয়ে গল্প আবর্তিত হয়। অ্যানিমে আধুনিক নির্মাণের একটি উদাহরণ, কিন্তু সেই গল্প বলতে মিয়াজাকি আশ্রয় নিয়েছেন জাপানি লোকসাহিত্যের। প্রথমেই তিনি গেছেন আত্মার কাছে। আত্মা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মানুষের লোভ, মোহ, ঈর্ষার বিষয়গুলো তুলে এনেছেন। তা দেখানোর জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন জাপানি লোকসাহিত্যের ইয়োকাই, শিকিগামি নামক সুপারন্যাচারাল চরিত্রদের। আর জাপানি সাহিত্য, সিনেমা ও অ্যানিমেতে কাপ্পা নামক কল্পিত প্রাণীটিকে দেখা যায় বারবার। মিয়াজাকি ও জাপানের অন্যান্য নির্মাতার অ্যানিমেতে ফোকলোরের ব্যবহার নিয়ে আলাদা করে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়।

কিন্তু ততখানি জানাশোনা আমার নেই। আর এর মধ্যেই কোনো কারণে বুকের মধ্যে ঢেউ জাগে। নৌকার তলায় নদীর ঢেউ বাড়ি খেলে যে শব্দ হয় সেটা মাথায় বাড়ি দিলেই মনে পড়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখায় পড়া—সে এক পরস্তাব। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে কোনো কেচ্ছা বলার হলেই এই কথাটা দিয়ে শুরু হয়। পরস্তাব মূলত দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনো গল্প। কিস্‌সা। লোকসাহিত্য। অদ্বৈত তাঁর লেখায় বহু পরস্তাব ব্যবহার করেছেন। কথা হলো, কে করেননি?

স্কটল্যান্ডে বহু প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় ম্যাকবেথের গল্প। হাজার বছর আগে ম্যাকবেথ ছিলেন ‘কিং অব স্কটল্যান্ড’। *ওথেলো*? রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানলাম, ইতালিয়ান লেখক সিনথিয়ার ছোট একটা উপন্যাস আছে ওথেলোর গল্প নিয়ে। অর্থাৎ, এ-ও লোকসাহিত্য প্রভাবিত।

কোভিডের পর বাংলা সিনেমা নতুন এক রূপ নিয়ে এগিয়ে এল। প্রথম ঝাপটা দিল ‘হাওয়া’—মেজবাউর রহমান সুমনের সিনেমা। মুক্তির আগ থেকেই সবাই বলছিল এবং মুক্তির পর সবাই নিশ্চিতভাবেই বলল, গল্পটা মনসা থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু কারণ ব্যাখ্যা করতে ভুল করেছে বহুজন। *মনসামঙ্গল*-এর মনসা রুদ্ররূপী। তার রুদ্র হওয়ার কারণ আছে। পিতৃপরিত্যক্ত এই মেয়ে নানা ঘাটে ধাক্কা খেয়েছিল। তারপর হয়েছিল প্রতিবাদী, প্রতিশোধপরায়ণ। সিনেমার গুলতিও সেরকমই। প্রতিশোধ নিতে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের মতো গুলতিও চান মাঝির লোকলশকর এক এক করে হত্যা করতে। সর্বশেষ সে ইব্রাহিমের লাশ ধরে বসে থাকে, যেমনটা ধরে বসেছিল বেহুলা। এক সিনেমাতেই মনসা থেকে বেহুলায় পরিণত হয় গুলতি। *মনসামঙ্গল* লিখিত কাব্য হলেও মনসার গল্প লোকসাহিত্যে নানা সংস্করণ ও ব্যাপ্তিতে বিরাজ করে। সুমন সেখানে আরেকটি সংযোজনই করলেন। আধুনিক মনসা ও বেহুলা।

পুঁজিবাদ নিয়ে আজ নানা কথা হলেও বিষয়টা পুরোনো নয়। বহু আগে থেকেই চলে আসছে। চাঁদ সওদাগর ছিলেন অভিজাত আর মনসা নীচু জাত। সে দেবীত্ব পাবে তা চাঁদ তো দূরে থাক, অভিজাত আরও অনেকেই চায়নি। বিষয়টা সাব-অল্টার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এরকমই।

পুরাণ অনেক ক্ষেত্রেই লোককথা হয়ে ওঠে। পুরাণ ও লোককথার পার্থক্য অবশ্য সুস্পষ্ট। তবু পুরাণ আর লোককথা কখনো কখনো পাশাপাশি হেঁটে যায়।

তবে এর বাইরেও একেবারে লোকমানুষের মুখের কথা, গল্পের দিকেও যদি তাকাই, তা-ও প্রভাবিত করেছে আধুনিক সাহিত্যকে। পাঞ্জাবের চারটি জনপ্রিয় প্রেমকাহিনি ‘মীর্জা সাহেবা’, ‘সাসি পান্নু’, ‘হীর রাঞ্ঝা’ আর ‘সোহিনী মহিওয়াল’কে উপজীব্য করে এখনও গল্প রচিত হয়, সিনেমা তৈরি হয়। পারস্যের কবি নিজামী গঞ্জাভি ‘লায়লা-মজনু’কে তাঁর কবিতায় নিয়ে এসেছিলেন। শতাব্দীভর সেই গল্পের থিম নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে, সিনেমা তৈরি হয়েছে, গান তৈরি হয়েছে। ‘লায়লা-মজনু’র এই গল্পও মূলত সপ্তম শতকের আরবের লোককথা থেকেই এসেছে। ইমরুল কায়েস টিকে থেকেছেন আরবের লোককথার মধ্যেই। এরপর নিজামীর কবিতা ও তারপর আধুনিক সাহিত্য, সিনেমায়।

পুরাণের সঙ্গে লোককথার পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট পার্থক্য লোককথার সঙ্গে ইতিহাসের। তবু লোককথা আর লোকসাহিত্য একসময় ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে যায়। তারপর চলে আসে জনপ্রিয় ধারায়। তাই প্রশ্ন তোলাই যায়, লোকসাহিত্যের প্রভাব কোথায় নেই? লোকসাহিত্য আছে সর্বত্র; চিরপ্রবহমান আধুনিক শিল্পের শিরা-উপশিরায়।

লেখক : প্রাবন্ধিক

পুঁথি বাংলার...

শেষ পৃষ্ঠার পর

এই মতে দিন যায়, বছর পেরোয়। বারো মাসের ঋতু পরিবর্তনের সাথে নারীর বিরহগাথা জমে। সে গানের নাম হয় ‘বারোমাসী’। হয়তো কোনো সমঝদার একদিন তা খুঁজে পাবেন। গানের ছত্রে উজাড় হবে প্রকৃতির কোলে বাঙালি জীবন।

‘সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা’ বাংলার যে রূপ, তা দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে আমাদের লোকসাহিত্যে। পূর্ববঙ্গে এক সময় এই ধরনের দ্বিপদী পয়ারে রচিত কাহিনি লোকের মুখে মুখে ফিরত, যা পুস্তকরূপ নিয়েছিল মুদ্রণযন্ত্র আসার পরে। গ্রামে একজন যদি শিক্ষিত লোক থাকেন, অবসরকালে উঠানে তাঁকে ঘিরে বসবেন সবাই, বই থেকে এসব কাহিনি পড়া হবে, আর লোকে সেই মহার্ঘ্য বইটির নাম জানবে ‘পুঁথি’। কণ্ঠ আর কানের ভরসায় টিকে থাকতে হতো বলে স্বাভাবিকভাবেই গদ্যের চেয়ে পদ্যরূপে তাদের পাওয়া যেত বেশি। আর গ্রামবাংলার কাদামাখা গাছে ঢাকা আবহাওয়ায় সবচে’ মানিয়ে যেতো যে ছন্দটা, তার নাম ‘দ্বিপদী পয়ার’। ইতোমধ্যে উল্লেখিত সব কয়টা পদ্য এই ছন্দে লেখা।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ‘পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা’ নামে ৪ খণ্ডে এমন গোটা-পঞ্চাশ ‘পুঁথি’ সংগ্রহ করেছিলেন, মোগল আমল থেকে কোম্পানি আমলে যেসব প্রচলিত ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। একই কাহিনির একাধিক বয়ানও মেলে তার মাঝে। এই চার খণ্ডের এক খণ্ড বহুল পরিচিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ নামে। মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা, চন্দ্রাবতী—নানান চরিত্রের নামে যে গল্পই গীত হোক, সকলেই একটা বিষয় প্রাঞ্জল রেখেছে : তা হলো তৎকালীন সমাজ-জীবনের ছবি। ছাপাখানার প্রচলনের সাথে ‘পুঁথি’র অপ্রতুলতা বই দিয়ে প্রতিস্থাপন হয়ে গিয়েছিল। পদ্য’র আধিপত্যের স্থান নিয়েছিল গদ্য। কিন্তু ‘পয়ার’ ছন্দের জনপ্রিয়তা কমেনি।

গল্প খুঁজতে কোথায় যাব? সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রে একটা চল শুরু হয়েছে মধ্যযুগের গল্পের, সেই রাজা রানি আর ঢাল তলোয়ারের গল্প। আমাদের যদি তেমনটা আগ্রহ হয়, তাহলে বাংলার মাটি বাংলার জলে গড়ে ওঠা দ্বিপদী পয়ারের পুঁথিগুলোই হতে পারে অমিত সম্বল। আমাদের যে অতীত জীবন, লোকসাহিত্য ছাড়া আর কে তা মনে করাতে পারে!

‘পুঁথি’ সংগ্রহ এবং চর্চায় অনেক সুযোগ আছে এখনো। সারাদেশে নানান আর্কাইভ, যাদুঘর, পাঠাগারে জমে আছে পুরনো দিনের পুঁথি—তালপাতা, তুলোট কাগজে লেখা। তাদের পাঠোদ্ধার এবং ছাপায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের যে দৈন্য, তাকে ঘোচাবার যাত্রা শুরু হতে পারে এইখানেই।

লেখক : ইনফ্লুয়েন্সার, ‘মুসার বইযাত্রা’

বেঙ্গলবুকস প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস

দেশভাগের দুটি উপন্যাস
আবদুল মান্নান সৈয়দ
মূল্য : ৩৫০৳

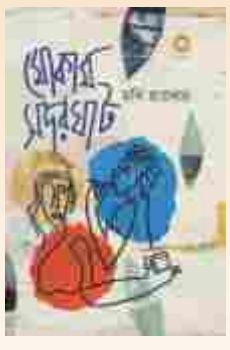
মোকাম সদরঘাট
মনি হায়দার
মূল্য : ৮৬০৳

রূপকুমার ও হরবোলাসুন্দরীর অসমাপ্ত পালা
প্রশান্ত মৃধা
মূল্য : ২৫০৳

ঘোড়সওয়ার মেয়েটি
হাসনাত আবদুল হাই
মূল্য : ২৬০৳

মানুষরতন
মুম রহমান
মূল্য : ৩৬০৳

পুরানা আমলের এইসব ভেদের কোনো মীমাংসা আসে নাই
আকিমুন রহমান
মূল্য : ৩২০৳

বেগানা
স্বকৃত নোমান
মূল্য : ৩২০৳

বাতাসে ফুল ঝরে যায়
উম্মে ফারহানা
মূল্য : ২৫০৳

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd

স্টল নম্বর : ৬১৭—৬২১

লো ক গ ল্প

জমিদারবাড়ির বড় বউ

এহসান হায়দার

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

অনেক পুরোনো দিনের কথা। সেকালের বাংলা আজকের মতো খোলা মাঠের দেশ ছিল না—চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়, বুনো জঙ্গল, সরু কাঁচা পথ, আর নদী-খাল-বিলে ভরা বিস্তীর্ণ ভূমি। সূর্য ডোবার পর গ্রামগুলো ডুবে যেত গভীর অন্ধকারে। সেই অন্ধকারই ছিল চোর-ডাকাতদের আশ্রয়।

সেই সময় নদীতীরের এক সমৃদ্ধ গ্রামে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিশাল জমিদারবাড়ি। উঁচু ফটক, মোটা প্রাচীর, দোতলা অট্টালিকা, সামনে শানবাঁধানো পুকুরঘাট—সব মিলিয়ে বাড়িটি যেন ছোটোখাটো দুর্গ। রাতে প্রহরীরা টহল দিত, তবু দূর-দূরান্তে ডাকাতদের উৎপাতের গল্প শোনা যেত।

সেই অঞ্চলে ছিল এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের নেতা, মধু সর্দার। মধু সর্দার বুদ্ধিমান, চতুর এবং নিষ্ঠুর বলেই পরিচিত ছিল। সে তার সাঙাত দ্বারা খবর পেয়ে গেল—জমিদারবাড়িতে সদ্য ধনসম্পদ এসেছে। পরিকল্পনা হলো, এ বাড়িতে ডাকাতি হবে, জমিদারের সম্পদের কোনো কানাকড়িটিও বাকি রাখা যাবে না। সামনে যে এসে দাঁড়াবে তার কল্লা ফেলে দেবে।

ডাকাত দল দিনের আলোতেই লুকিয়ে এসে জমিদারবাড়ির পুকুরের উল্টো পাশের ঘন বাগানে আশ্রয় নিল। আম, কাঁঠাল, জাম আর বাঁশঝাড়ে ঘেরা সেই বাগান তাদের আড়াল করে রাখল। ঠিক হলো, রাত গভীর হলে হামলা হবে।

সন্ধ্যা নামল। আকাশে পাখির ডাক থেমে গেল। ঠিক তখন জমিদারবাড়ির শানবাঁধানো ঘাটে এলেন বাড়ির বড় বউ। তিনি গৃহস্থালির কাজে নিজেই হাত লাগাতেন। হাতে ছিল বড় একটি পিতলের গামলাভরা তাজা মাছ।

ঘাটের সিঁড়িতে বসে তিনি মাছ ধোয়া শুরু করলেন।

ডাকাতরা বাগানের আড়াল থেকে সব দেখছিল।

হঠাৎ মধু সর্দার অবাক হয়ে দেখল—মাছ ধোয়ার ফাঁকে বউটি দুহাতের পানি তুলে মুখে চেখে নিচ্ছেন। আবার মাছ ধুলেন, আবার সে পানি মুখে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করলেন।

মধু সর্দার ফিসফিস করে বলল, 'এ আবার কেমন আচরণ! মাছ ধোয়া পানি কেউ মুখে নেয় নাকি?'

তার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠল। সে ঠিক করল—আজ এই রহস্য জানতেই হবে।

রাত গভীর হলো। চারদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ দরজা ভাঙার শব্দ!

চিৎকার!

তলোয়ারের চিকচিক, একেবারে অস্ত্রের ঝনঝন!

ডাকাত দল জমিদারবাড়িতে ঢুকে পড়ল। প্রহরীদের বেঁধে ফেলা হলো। পরিবারের সবাইকে একত্র করা হলো।

মধু সর্দার গর্জে উঠল—

'আজ সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে যে মাছ ধুয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকটিকে আমার সামনে আনো!'

ভয়ে কেউ কথা বলছিল না। কিছুক্ষণ পর বড়ো বউ নিজেই এগিয়ে এলেন।

বললেন, 'আমি মাছ ধুয়েছিলাম।'

মধু সর্দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'তুমি মাছ ধোয়া পানি মুখে নিলে কেন? সত্যি বলো!'

বড়ো বউ শান্ত স্বরে বললেন, 'মাছ ভালো করে ধোয়া হলে পানিটা মিঠে লাগে। তখন বুঝি মাছ পরিষ্কার হয়েছে। তাই স্বাদ নিয়ে দেখছিলাম।'

ডাকাত সর্দার হতভম্ব। এত সহজ, অথচ এত যত্নশীল হয় মানুষ!

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—

'তাহলে সেই মাছ রান্না করো। আমরা খেয়ে দেখি।'

বাড়ির লোকজন আতঙ্কে কাঁপলেও বড় বউ স্থির রইলেন। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে মসলা বেটে, পেঁয়াজ কেটে, ধোঁয়াওঠা কড়াইয়ে মাছের তরকারি রান্না করলেন। সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অল্প সময়ের মধ্যেই গরম ভাত ও মাছের ঝোল পরিবেশন করা হলো।

ডাকাতরা খেতে শুরু করল।

মধু সর্দার প্রথম লোকমা মুখে দিয়ে থমকে গেল। তারপর ধীরে ধীরে খেতে লাগল। তার চোখে বিস্ময়, মুখে তৃপ্তি।

খাওয়া শেষে সে গভীর স্বরে বলল, 'এমন স্বাদ আমি জীবনে পাইনি। যে নারী মাছ ধোয়ার পানির স্বাদ নিয়ে পরিচ্ছন্নতা বোঝে, সে সংসারও ঠিক তেমন যত্নে রাখে।'

সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ আমরা এই বাড়িতে ডাকাতি করব না। এই গুণবতী নারীর সম্মান রাখতে হবে। ধন্য তুমি, মা।'

ডাকাত দল সকলের বাঁধন খুলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল অন্ধকারে।

পরদিন সকালে গ্রাম জুড়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল—ডাকাতি হয়নি, বড় বউয়ের প্রজ্ঞা ও গৃহস্থবুদ্ধিই বাড়িকে রক্ষা করেছে।

সেই থেকে গ্রামের মানুষ বলত—বুদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা ও ধৈর্য—এই তিন গুণে গৃহ রক্ষা পায়।

আর মধু সর্দারের গল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে—ভয়ংকর ডাকাতও সত্যিকারের গুণের সামনে মাথা নত করেছিল।

আজও গ্রামের পর গ্রামে প্রবীণরা গল্প শোনাতে বসলে বলেন—

'শক্তি নয়, প্রজ্ঞাই সবচেয়ে বড় রক্ষা।'

ছড়া

মেলায় যাই রে

হিজল জোবায়ের

বাবা হেঁটে যাবে, কিছু পথ আমি
চড়ে যাবো তার ঘাড়ে
টলটলে নদী, নৌকায় করে
তারপর ওই পাড়ে

হঠাৎ কোথাও পাকা গমক্ষেত
বাতাসে দুলছে, ইস্
হেলছে-দুলছে, আমাকে ডাকছে
সোনারং ধরা শীষ

পানের বরোজ পাশ কেটে গেলে
ফাঁকা এক ময়দানে—
পাখির মতন ডানা মেলে রাখা
জটাধারী এক চোখ বুজে থাকা
বটগাছ সেইখানে

জড়াজড়ি করে মাটিতে নেমেছে
কতো-না বটের ঝুরি,
সেই গাছ ঘিরে এই নদীতীরে
পসরা সাজিয়ে মেলা বসেছে রে
আকাশে উড়ছে ঘুড়ি

বাবা, তুমি কতো আদরের বাবা
কতোই-না ভালো ছেলে,
বৈশাখ এলো, তারই সাথে করে
আনন্দে ভরা মেলাচত্বরে
আমাকেও নিয়ে এলে!

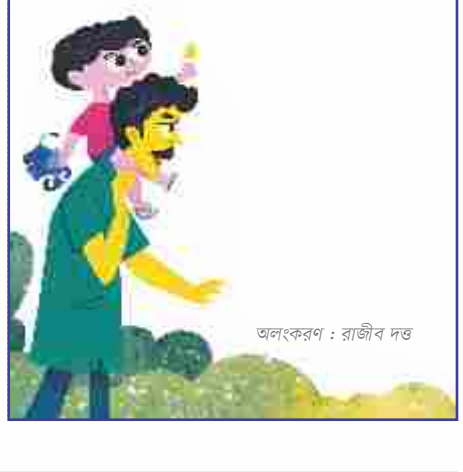

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

কিন্ডারবুকস প্রকাশিত শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু বই

স্টল নম্বর ৮১, ৮২ ৮৩

অগ্নির অভিযান
শাহরিয়ার
মূল্য : ৩৮০৳

বিজ্ঞানী বক্স-১
আহসান হাবীব
মূল্য : ২৫০৳

3 গ্রাফিক নভেল
আহসান হাবীব
মূল্য : ৩৮০৳

বাহরাম জং-১
রাগিব নিহাল তন্ময়
মূল্য : ২২০৳

আবাদির ফাঁদে সিংহ কাঁদে
হাসান হাফিজ
মূল্য : ২০০৳

মাহাদেনা মুক্তা
রাশেদ আহমেদ
মূল্য : ২২০৳

কাকাতু
কুমারেশ ঘোষ
মূল্য : ২০০৳

/kinderbooksBD   www.kinderbooks.com.bd   বই পেতে কল করুন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮১, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩

শেষ পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুর পর এ ঘাটুগানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা শুরু হয়। সামাজিক পরিসরে মানুষের আগ্রহ ঘাটুগানের প্রতি বাড়ানোর জন্য এ গান লেখার সময় গীতিকাররা আদিরসাত্মক কথাবার্তা যোগ করতে শুরু করেন। এদিকে গবেষকদের তথ্য পর্যালোচনা করে জানা যায়, ঘাটুগানের উদ্ভব বৃহত্তর সিলেটের অন্তর্গত হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জের জলসুখা গ্রামে। শুরুতে ঘাটুগানে অধ্যাত্মবাদ থাকলেও পরবর্তীতে তা লোকসাহিত্যের একটি ধারায় পরিণত হয়। শুরুতে লোকগীতির এ ধরনটি মন্দিরকেন্দ্রিক ছিল। মন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ ধরনের গান-গীত হতো। অধ্যাত্মবাদকে অন্তর্ভুক্ত করেই এ গীতিকা লেখা হতো। তবে একসময় ঘাটুগানের জনপ্রিয়তা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় এটি অনেকাংশে বাণিজ্যিক রূপও পায়। গ্রামে গ্রামে গঠন হয় সৌখিন ও পেশাদার ঘাটুদল। কালক্রমে ঘাটুদল গঠন করতে শুরু করে সৌখিন মুসলিমরাও। হিন্দু-মুসলিম এ দুই সম্প্রদায়ই ঘাটু দল গঠনে প্রতিযোগিতা শুরু করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাছ-বিচার কিংবা সাহিত্যগুণের বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো না। তাই ঘাটুগান একটি ভিন্ন ধরনের লোকসাহিত্য। বিধিনিষেধ না থাকায় এ লোকসাহিত্যের ধরনটি নিরপেক্ষই ছিল। ভাটি অঞ্চলে এটি যেন উন্মাদনার রূপ নেয়।

ঘাটুগানের পরিবেশনরীতি নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কবি জসীমউদ্দীন লিখেছেন, '২০/২৫ জন লোক একটি স্থানে বৃত্তাকারে উপবেশন করে। তাহাদের মধ্যে ঘাটুর ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরিয়া বসিয়া থাকে। গানের সুর যখন খুব জমিয়া ওঠে তখন ঘাটুর ছেলেরা দাঁড়াইয়া সেই সুর এবং গানের কথাকে রূপ দেয় তাহাদের নৃত্যের মাধ্যমে। বৃত্তাকারে যেসব গায়কদল উপবেশন করে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা করিয়া রঙিন রুমাল থাকে। মাঝে মাঝে সেই রুমাল উড়াইয়া তাহারা গানের সুরকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে জানুর ওপর ভর করিয়া কিঞ্চিৎ ওপরে উঠিয়া প্রত্যেকের হাতের রুমালগুলি কাঁপাইতে থাকে। কখনো হাত প্রসারিত করিয়া সমস্ত বৃত্তটিকে ঘের দেয়। দলপতির ইঙ্গিতে দোহারেরা এরূপ ওঠানামা করিয়া থাকে। তাহার তল দিয়া রঙিন পোশাক পরিহিত বালকেরা নানা ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। দোহারেরা মিলিয়া যে গান করে তাহাকে ছওম বলে। একই গান কতকটা বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। একই কথা নানা ভঙ্গিতে গাহিয়া গায়কেরা অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করে। মাঝে মাঝে দোহারের গান থামিলে ঘাটুর ছেলেরা একক গান করে। সেই সব গান বন্ধের বিচ্ছেদ।'

জসীমউদ্দীন ঘাটুগানের বিবরণ দিয়েছেন এবং ময়মনসিংহের আঠারবাড়ী বাজারের বিরামপুরে আবদুল হামিদ মিঞার ঘাটুদলের গান শুনেছেন। তিনি লোকসাহিত্য হিসেবে ঘাটুগানের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। এ জন্যই ওই ঘাটুদলের কাছ থেকে ছয়টি গান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জ থানার চর ঈশ্বরদী গ্রামের গায়ক মনিরুদ্দীনের কাছ থেকে চারটি ঘাটুগান সংগ্রহ করেন। প্রথম গানে তমালের ডালে বসে কোকিলের গান গাওয়াকে বিষয় করে গায়ক গাইছেন—'তমালেরি ডালে বসে/কোকিলা কি বলে রাইগো।/ময়না পেলেম তোতা পেলেম/আরও পেলেম লালরে।/ সোনামুখী দোয়েল পেলাম/যার পাকা বুলিরে।'

এর সাহিত্যিক মানটি বোঝা জরুরি। তমালের ডালে বসে কোকিলের ডাক যেন সুখবরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ময়না, তোতা, লাল এবং সোনামুখী দোয়েলের উল্লেখ করে কবি নানা সুন্দর ও প্রিয় জিনিস পাওয়ার আনন্দ বোঝাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে 'পাকা বুলি' বলা দোয়েলটি বুদ্ধিমত্তা ও মধুর কথার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরের গানে রয়েছে—'রূপ গো আমার মনের মাঝে/আচানক এক রূপ সইগো/যমুনার কিনারে সই গো।/কী হইলো কী হইলো সই গো উপায় বল না,/কলসী বুড়ায়ে গো জলে/আমি চাইয়া রইলাম রূপ গো পানে/যমুনার কিনারে।'

আগের গানের মতো এখানেও আছে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। কলসিতে জল ভরে যে রূপের পানে চেয়ে রইলে রাধা, সে তো তমালের ডালে বসে বাঁশিবাদনরত কৃষ্ণই। সে বৃন্দাবনেরই কৃষ্ণ তা স্পষ্ট হয়েছে পরের গানে—'যাব না যাব না আমি সেহি বৃন্দাবনে/সই গো সেহি বৃন্দাবনে,/সইয়া বোল বোল/যেমনি কাজ করিলাম তেমনি ফল পাইলাম/দরখাস্ত দিয়ে স্বামী না হয়ে/জল দিব সিইখানে,/মধু নাই বলে একি শুনালে,/অলি নাই সেই বনে।'

এ তো নির্ঘাৎ প্রেমের গান। রাধাকৃষ্ণের সেই চিরায়ত প্রেমের গান। পরের গানে আছে স্নানের বিবরণ, শাড়ি ও গামছা ভেজানোর প্রসঙ্গ—'নিহারে ভিজিল রে শাড়ি/গামছা কেনে ভিজাও না,/আমার লাল রে বরণ,/বন্ধের গামছা নীলার বরণ,/হৈল কি কারণ,/গামছা খান ভিজায়া বন্ধে/পুরাও মনের বাসনা।'

পরের গানটি কবি জসীমউদ্দীন সংগ্রহ করেছেন কিশোরগঞ্জের কোনো এক গায়কের কাছ থেকে। সেই গায়কের নাম যে তিনি সংগ্রহকালে ভুলে গেছেন, সে কথাটিও তিনি উল্লেখ করতে ভুল করেননি—'বাতাসে উড়ায়ে রে নিল/নিঠুর বন্ধের চাদরখান/ওরে নিঠুর বন্ধের চাদরখান গো/আমার বন্ধের চাদরখান।/উত্তর থেকে আইল রে বাতাস দক্ষিণ দেশে/আমার বন্ধে রসিক চান্দে আসাম চলে যায়।'

এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও অনুপস্থিতির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। বাতাসে উড়ে যাওয়া 'বন্ধের চাদরখান' প্রিয় মানুষের স্মৃতি ও সান্নিধ্য হারানোর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর দিক থেকে আসা বাতাস এবং প্রিয়জনের 'আসাম চলে যাওয়া' কথাগুলো বিচ্ছেদের ভৌগোলিক দূরত্বকে বোঝায়। এখানে বন্ধুকে 'রসিক চান্দ' বলা হয়েছে, যা তার সৌন্দর্য ও প্রিয়ত্বের ইঙ্গিত দেয়; ফলে পুরো অংশে স্মৃতিবাহী প্রেম ও হাহাকারের আবহ ফুটে উঠেছে।

এই হচ্ছে প্রকৃত ঘাটুগান। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মেয়ে সেজে নাচতে ও গাইতে আসা ছেলেগুলো হয়ে ওঠে সৌখিন সংগীতায়োজকদের লালসার শিকার, যা এই গানের ধারা বিলুপ্তির কারণ।

সময়ের প্রবাহে এই ধারা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এর পেছনে কয়েকটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণ কাজ করেছে। একসময় এটি গ্রামীণ বিনোদনের জনপ্রিয় মাধ্যম হলেও পরে কিশোরদের নারীর বেশে উপস্থাপন এবং সম্ভাব্য শোষণের অভিযোগে সমাজে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। ফলে পরিবারগুলো সন্তানদের এ ধারায় যুক্ত করতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। জমিদার বা স্থানীয় ধনীদের আনুকূল্য একসময় এ ধারাকে টিকিয়ে রাখত। সেই পৃষ্ঠপোষকতা উঠে গেলে শিল্পীরা বিকল্প জীবিকার সন্ধান করেন এবং ধারাটি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক প্রশ্নও এর বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে। শিশু অধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন সামনে আসায় এই প্রথা আর গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এসব কারণ মিলেই ঘাটুগান আজ ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে।

লেখক : কবি ও ফোকলোরবিদ।
পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হারিয়ে যাওয়া...

> ঘাটুগানের উদ্ভব বৃহত্তর সিলেটের অন্তর্গত হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জের জলসুখা গ্রামে। শুরুতে ঘাটুগানে অধ্যাত্মবাদ থাকলেও পরবর্তীতে সেটি লোকসাহিত্যের একটি ধারায় পরিণত হয়

বুক রিভিউ

জীবনজিজ্ঞাসা ও তার উত্তরের গল্প

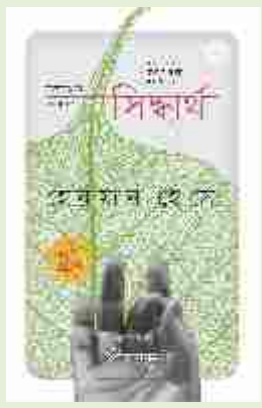

সিদ্ধার্থ

মূল : হেরমান হেসে
ভাষান্তর : শীলভদ্র

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস
মূল্য : ৩৮০৳

শীলভদ্রের অনুবাদে পড়া হলো সাহিত্যে নোবেলজয়ী হেরমান হেসের বিশ্বখ্যাত উপন্যাস *সিদ্ধার্থ*। ভিক্ষু শীলভদ্র বইটি অনুবাদ করেছিলেন একশো বছর আগে। সেই অনুবাদেরই শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ হিসেবে বইটি বের করেছে বেঙ্গলবুকস।

বইটি পড়তে গিয়ে গভীর এক ঘোর কাজ করেছে। কী অপূর্ব বর্ণনা! প্রকৃতিকে এমন জীবন্ত করে তোলা—নদীর কথা পড়তে গিয়ে যেন চোখের সামনে নদীই ভেসে ওঠে।

সাদা, ধূসর আর সবুজের শান্ত মিশেলে করা এই সংস্করণের প্রচ্ছদটিও ভীষণ স্নিগ্ধ।

এই উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ—একজন তরুণ ব্রাহ্মণ কুমার। জীবন নিয়ে তার প্রশ্নের শেষ নেই। শাস্ত্রপাঠ, যাগযজ্ঞ—কোনো কিছুই তাকে তার প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। সে গৃহত্যাগ করে, উত্তর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে বনে। সঙ্গী হয় বন্ধু গোবিন্দ।

দুই বন্ধু ঘুরে বেড়ায় নানা তীর্থে, আশ্রয় নেয় সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে। গোবিন্দ তাদের জ্ঞানচর্চা আর বাণীতে মুগ্ধ হলেও সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। একদিন তারা গৌতম বুদ্ধের কথা জানতে পারে। তাঁর সম্পর্কে শোনা কথার মধ্যে যেমন আশা আছে, তেমনই আছে সংশয়। বুদ্ধের সন্ধানে বের হয় দুই বন্ধু। বুদ্ধের উপদেশ শুনে গোবিন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, থেকে যায় উদ্যানে। এখানেই সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দের পথ আলাদা হয়।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে না ঠিকই, তবে বুদ্ধের শান্ত-স্থির ভাব, তাঁর মুখে প্রশান্তির ছায়া, তাঁর দৃষ্টি ও হাসি, চলা ও বসা সিদ্ধার্থকে মুগ্ধ করে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে এসে আমরা সিদ্ধার্থ ও গৌতম বুদ্ধের মধ্যে চমৎকার একটি কথোপকথন দেখতে পাই, যেখানে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের উপদেশ শোনার পর তার অনুভূতি সম্পর্কে জানায়। সাথে এটাও জানায় যে কেন সে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে না। বুদ্ধ শুনে যান নিশ্চুপভাবে। জবাব যেটুকু দেন তাও খুব শান্তস্বরে। বুদ্ধ যেন শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। শিষ্যত্ব না নিলেও, বুদ্ধের মতো এমনই হতে চায় সিদ্ধার্থ। বুদ্ধ যেভাবে অহংকে জয় করেছেন, সেভাবে সে নিজেও অহংকে জয় করতে চায়। বুদ্ধের উদ্যান থেকে গোবিন্দকে ছেড়ে যাওয়ার সময় সিদ্ধার্থের উপলব্ধি হয়, 'বুদ্ধ আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার সবকিছু অপহরণ করেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস। তিনি অপহরণ করেছেন আমার বন্ধুকে। গোবিন্দের আস্থা ছিল আমার ওপর, এখন সে নির্ভর করে বুদ্ধের ওপর। একদিন গোবিন্দ ছিল আমার ছায়া, এখন সে হয়েছে গৌতমের ছায়া। কিন্তু তিনি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থকে, আমাকে।'

উপন্যাসে আমরা মাঝি বাসুদেবের দেখা পাই। যে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের উপদেশবাণী শুনেও শিষ্যত্ব নেয়নি, সে জীবনে যা কিছু শেখা দরকার তার অনেক কিছুই শিখল বাসুদেবের থেকে। বাসুদেব এ উপন্যাসের এক অন্যতম প্রধান চরিত্র। সেরকম আরেকটি প্রধান চরিত্র হলো কমলা। যে একসময় সিদ্ধার্থের প্রেমিকা ছিল এবং পরবর্তীতে সিদ্ধার্থের পুত্রের মা হয়েছে।

সিদ্ধার্থ এমন একটি উপন্যাস—যেখানে জ্বলন্ত জীবনজিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর পাওয়ার যে আকুতি, তা অনিন্দ্য শিল্পে রূপ পেয়েছে।

নীলিমা রশীদ তৌহিদা, ঢাকা

প্রবন্ধ

লোকায়ত জীবনে লোকসাহিত্য

সুমনকুমার দাশ

বাঙালির সংস্কৃতি বৈচিত্র্যে ভরপুর। তবে নগরায়ণের প্রভাবে আমরা যেন সে বৈচিত্র্য ভুলতে বসেছি। এর সাংস্কৃতিক কারণটি বোঝা জরুরি। বাঙালির সংস্কৃতি গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মূল সমস্যা হলো, এ সমাজকে আমরা পশ্চাৎপদ সমাজ বলেই অভিহিত করে আসি। হাস্যকর বিষয় হলো, এ সংস্কৃতিকেই শহরে নানা উৎসবের উপলক্ষ হিসেবে উদযাপন করা হয়। এই যেমন 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বলে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে। এ প্রবাদটি শহরের মানুষের কাছে প্রবাদই। অথচ গ্রামীণ মানুষের কাছে কথাটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এই যে পার্বণের কথা, এ পার্বণের মধ্যে লোকসংস্কৃতি এমনকি লোকসাহিত্যের অনেক উপাদান রয়েছে।

গ্রামীণ জীবনে আছে প্রতিবন্ধকতা আর সংকট। কিন্তু তারপরও যাপিত জীবনের তাগিদেই সেখানে ঘটা করে নানা উৎসব, আচার ও অনুষ্ঠান পালিত হয়। এসব উৎসব, আচার কিংবা অনুষ্ঠান কখনও ধর্মীয় লোকাচার, কখনও চিত্তবিনোদনের মাধ্যম আবার কখনও লোকসমাজের প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে আয়োজিত হয়। তাই বাঙালির শহর কিংবা গ্রামীণ, দুই ধরনের জীবনেই লোকসংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি প্রভাব আছে।

নগরায়ণ ও প্রযুক্তির এ যুগে অনেক রীতি-রেওয়াজ হারিয়ে গেছে। লোকসংযোগের আনন্দ-উচ্ছ্বাসও অনেকাংশে ফিকে হয়ে গেছে। তারপরও লোকসংস্কৃতির নানা উপলক্ষ সাবলীলভাবে হয়ে আসছে। নববর্ষের মতো উৎসব তো আছেই। আবার চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজন, চড়কপূজা, শিব-গৌরীর নৃত্য, দোল উৎসব, নীলনৃত্য, অষ্টক, গম্ভীরা, লোকগানের আসর, লাঠিখেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, ষাঁড়ের লড়াই, সাপের খেলার আয়োজন থাকেই। অঞ্চলভেদে আয়োজনের পন্থাও যায় বদলে। এগুলো সব হয় জীবনযাপনের ধরনের ভিত্তিতে। এসব আয়োজনে সবসময়ই নান্দনিক সাংস্কৃতিক চর্চার রীতি থাকে। এ লেখাতে মূলত সেদিকটা নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

গ্রামীণ জীবনধারা পালটাচ্ছে। বিশ্বায়নের এ যুগে নগরায়ণের প্রভাবেই গ্রামীণ সংস্কৃতি বৈচিত্র্য হারাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণার ঘাটতি আছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ধরনটি আলাদা। 'ফোকলোর' বলে একটি বিষয় রয়েছে। তবে ফোকলোর চর্চার সঙ্গে লিখিত সাহিত্যকে অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। সাহিত্যের বিচারটি আলাদা। লোকসাহিত্য প্রচলিত বই আকারে আসবে না। তবে সাহিত্যকে আমরা এখন আর বই হিসেবে বিবেচনা করি না। বরং সাহিত্যকে আমরা টেক্সট হিসেবে অভিহিত করি। তাই লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধরনকেও আমরা টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

বাঙালির লোকসাহিত্যে গীতিকবিতা, লোকগান, লোকগাথা, প্রবাদ, প্রবচন বড় জায়গা দখল করে আছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে অবশ্য টেক্সটের ধরন পালটে গেছে। আগের মতো হয়তো আসর করে আর লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান ব্যবহার হয় না। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো শহরে বাণিজ্যিক আদল নেওয়ায় সেখানে মানুষের মনের ছোঁয়া হারিয়ে গেছে। শহরের চাকচিক্য গ্রামীণ শ্রোতা-দর্শকদের কাছে ভিন্ন মেজাজে হাজির হচ্ছে। এ মেজাজ তাদের নিজস্ব নয়, মেকি। এটি তারা বোঝেন, তারপরও বাধ্য হয়ে এ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলে যান।

আমরা এখন অনেক বেশি মুঠোফোননির্ভর হয়ে গেছি। আর এ নির্ভরতার কারণেই লোকসাহিত্য-চর্চা ধীরগতির হয়ে গেছে। লোকসাহিত্যকে সংরক্ষণ, তাকে নিয়ে আলোচনা করার পরিসর সংকুচিত হচ্ছে। কারণ নতুন করে গ্রামীণ কোনো গীতিকার বা লোকনাট্যকার রচনা করছেন না কোনো গান কিংবা লোকনাটক। নতুন করে উঠে আসছেন না উল্লেখ করার মতো কোনো শিল্পী। এতে পুরোনো শিল্পীদের কণ্ঠের গানই প্রযুক্তির সুবাদে মুঠোফোনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা লোকগান ও সংস্কৃতির স্বাদ এখন মুঠোফোনেই উপভোগ করছেন।

গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় মুঠোফোন-সংস্কৃতির ভয়াবহ বিস্তারে যাত্রাগান থেকে শুরু করে অসংখ্য লোকসাংস্কৃতিক উপাদান মেমরি কার্ডে জায়গা পাচ্ছে। যখন ইচ্ছে তখন লোকসংস্কৃতির এসব অনুষঙ্গকে উপভোগ করা যায়। তাই আগের মতো রাত জেগে বাউলগান কিংবা যাত্রাগানের আসরে বসে সেসব উপভোগ করার উৎসাহ হারাচ্ছেন। ঘরে বসে-শুয়ে আরাম-আয়েশে বরং মুঠোফোনের বদৌলতে লোকশিল্পীদের গান উপভোগে উৎসাহটা বেশি থাকে।

এভাবে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী গানের ধারাগুলো দর্শক-শ্রোতার অভাবে অনেকটাই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বিপর্যস্ত ঐতিহ্যবাহী গানের ধারাগুলো লোপ পেয়ে এখন অনেকটা তলানিতে ঠেকেছে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও লোকগবেষক

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাঙালি সংস্কৃতির...

লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বাঙালির সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেখানে তিনি বাঙালির সংস্কৃতিকে আদিম সংস্কৃতি, নগর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি—এই তিনটি ভাগে বিন্যাস করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে আমি মনে করি, লোকসংস্কৃতিই বঙ্গসংস্কৃতির প্রধান ধারা। কারণ আমরা এখনও যে অর্থে নগরায়ণের কথা বলি তা কিন্তু এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরিণত নগরগুলো এখনও গ্রামীণ সমাজ-সভ্যতার স্মৃতি ও ছাপ বহন করে চলেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই ছিল বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

আপনার দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে আপনি সম্পাদনা, প্রবন্ধ রচনার কাজটি নিরলসভাবে করে গিয়েছেন। আপনার মৌলিক প্রবন্ধ ও সম্পাদনাগুলোর বিশাল একটি অংশ লোকসংস্কৃতি নিয়ে। আপনি লালন ফকির, গোঁসাই গোপাল ও হাসন রাজাকে নিয়ে তো লিখেছেনই। একই সঙ্গে আপনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব নিয়েও তথ্যসূত্র উপস্থাপন করে আলোচনা করেছেন। লোকসংস্কৃতিকেও মূলধারার সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করার বিষয়টি নিয়ে যদি আলোচনা করেন।

আবুল আহসান চৌধুরী : আমরা আসলে ভুলেই যাই, পুরাণ কিংবা লোকজ সংস্কৃতি ছাড়া কোনো ভাষার সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। এ কথা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একবার বিদেশের নানা ভাষার সাহিত্যের দিকেই তাকিয়ে দেখুন। সেখানে দেখবেন, পুরাণ কিংবা লোকজ সংস্কৃতি সাহিত্যে নানাভাবে উঠে এসেছে। বলা যায়, লোকসংস্কৃতিই ওই ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যের ভিত গড়ে দিয়েছে এবং ওই ভাষাগোষ্ঠীও নানাভাবে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান থেকে উদারভাবে ঋণ নিয়েছে। এ কথাটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সত্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করি তাহলে দেখব তিনিও তার অনেক রচনার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি থেকে দুহাতে ঋণ নিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথের গানে যে মরমি আবেদন তা একান্তভাবেই তৈরি হয়েছে লালন ফকির, গগন হরকরা, হাসন রাজার মতো মহৎ মহাজনের গানের প্রভাব থেকে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন? বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকে তাকান। কবি জসীম উদ্‌দীনের সাহিত্যই মূল্যায়ন করুন। জসীম উদ্‌দীনের শুধু গানই নয়, তাঁর অন্য রচনাতেও লোকজ জীবন, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি অসাধারণভাবে মিশে আছে। আর এসব রচনার প্রেরণাও তিনি লাভ করেছেন লোকসংস্কৃতি থেকে। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। এমন অনেক উদাহরণ টানা যেতে পারে। মূল কথা হলো, লোকসংস্কৃতির প্রেরণা নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় তার শক্তি এবং স্থায়িত্ব অন্য প্রেরণা থেকে আসা সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি হয় বলে আমি মনে করি। এ জন্যই জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে আজও এত প্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিভাবান ও উজ্জ্বল কবি বলেই বিবেচিত ও মূল্যায়িত হন। এর মূল কারণই হচ্ছে, তিনি মাটির কাছাকাছি থেকেছেন এবং মাটির শৈল্পিক ঘ্রাণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

একই কথা কিন্তু আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও উনি তাঁর সচেতন জীবনের একটা বিরাট অংশ শহরে কাটিয়েছেন। আর বাংলা সাহিত্যের এমন অনেক কবি আছেন যাঁরা শহরে থেকেও তাঁদের রচনার উপাদান নিয়েছেন লোকজ সংস্কৃতি থেকে। এ বিষয়ে আপনার কী মতামত?

আবুল আহসান চৌধুরী : একটু আগেও কিন্তু আমি একটা কথা বলেছি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই বাঙালির সংস্কৃতির মূলমন্ত্র ছিল এবং আছে। আমাদের অনেকেই বড় হয়েছে নগরে। তবে আমাদের মন কিন্তু এখনও পড়ে আছে সেই গ্রামীণ পটভূমিতে। নগরায়ণের কল্যাণে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দান-অবদানকে অকাতরে গ্রহণ করতে পেরেছি। সেসবের সুবিধা ঠিকই ভোগ করছি। ফলে আমাদের যাপিত জীবন হয়ে গেছে শহুরে। কিন্তু যদি একটু পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এক কি দুই পুরুষ আগে সবাই গভীরভাবে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল। দেখা যাবে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ গ্রামেই চিরজীবন বসবাস করেছেন এবং তার পরবর্তী পুরুষের কেউ নগরে এসেছেন জীবিকার তাগিদে। এ ক্ষেত্রে কেউ হয়তো কৃষকের সন্তান। আবার হয়তো কারো পূর্বপুরুষ অন্য কোনো লোকপেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কেউ তেলবণিক, কেউ জেলে, কামার-কুমোর—এমন কত পেশার মানুষ পাওয়া যাবে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে! এই শ্রেণি-পেশার মানুষই শহরে এসে এত রূপান্তরিত হয়েছেন যে এখন আর সেই গ্রামীণ চিহ্নটুকু পাওয়া যায় না। অনেকে তো নিজের নামও পালটে ফেলেছেন। ফলে একটা মেকি শহুরে আদল চলে এসেছে। কিন্তু শহুরে মানুষের আচার-আচরণ, বেশভূষা ও যাপিত জীবনে একধরনের কৃত্রিমভাব আমরা ঠিকই লক্ষ করি। তাই আমি তো বলব যে আমরা এখনও গ্রামীণ-শহরেই বাস করি। বলা যায় যে, গ্রামগুলো এখন বিদ্যুতায়িত হয়েছে। বিজ্ঞানের দান-অবদানের বদৌলতে জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু ওই গ্রামের যে সামাজিক কাঠামো, লোকজ যে বৈশিষ্ট্য তা আজও মুছে গেছে এমনটি বলা যাবে না। এ জন্যই মানুষ যতই নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করুক না কেন, তার শেকড়ের টানটাকে কিন্তু কোনোদিন ভুলতে পারবে না, পারেও না। এই শেকড়ই আসলে আমাদের অস্তিত্বের টান। আর এই টানের কারণেই আমাদের বারবার সেখানে পৌঁছাতে হয়। এটা আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে।

তার মানে আমাদের সাহিত্য কোনোভাবেই লোকজ সংস্কৃতির ছাপ থেকে মুক্ত নয়?

আবুল আহসান চৌধুরী : হ্যাঁ। সেটাই বলছি এতক্ষণ। আল মাহমুদের প্রসঙ্গটি টানতে গিয়ে আসলে শহরের এই জীবনের প্রসঙ্গটা টানতে হয়েছে। কারণ শহুরে জীবনযাপন এবং জীবনের ধরন আসলে ভোগবাদী। মানুষ যতই ভোগবাদী হোক না কেন, জীবনের একটা অর্থ সবসময়ই খোঁজার চেষ্টা থাকে। এই ভোগবাদী জীবন কোনোভাবেই মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না। অর্থ, বিত্ত, সম্মান, প্রতিপত্তি, যশ কিংবা আধুনিক জীবনের আয়েশ—আপনি যেটাই পান না কেন, একটা সময় এগুলো আপনাকে আর তৃপ্ত করতে পারে না। একটা সময় এসব ভীষণ অর্থহীন ও তুচ্ছ মনে হয়। মানুষ অনুভূতিকেই আসলে গুরুত্ব দিতে চায়। আর এ জন্যই মানুষ শেকড়ের সন্ধানে নেমে পড়ে।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

সাড়ে ৩ দিনের প·ত্রি·কা

বর্ষ ৪। সংখ্যা ৩। বুধবার। ৪ মার্চ ২০২৬। ১৯ ফাল্গুন ১৪৩২

লোকসাহিত্য বাতাসের মতোই উদার ও সীমাহীন—আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকলেও সবসময় মনে থাকে না

—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ভাষাবিজ্ঞানী

| সাক্ষাৎকার |

বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারা লোকসংস্কৃতি

—আবুল আহসান চৌধুরী

আবুল আহসান চৌধুরী। জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩ কুষ্টিয়ার মজমপুরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর গবেষণা শেষে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত হন। অধ্যাপনা ছাড়াও সমাজমনস্ক, লোকজ ঐতিহ্যসন্ধানী গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি পরিচিত। তাঁর লালন সাঁই, কাঙ্গাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেনকে নিয়ে রচিত গবেষণা রয়েছে। গবেষণায় অবদানের জন্য ২০০৯ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার* জন্য তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **আমিরুল আবেদিন**

লোকসংস্কৃতিকে আসলে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমরা শুরুতে এই জায়গা থেকেই শুরু করি।

আবুল আহসান চৌধুরী : আসলে বাঙালির সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা এসেছে লোকসংস্কৃতি থেকে। একথা আমি আমার একটি বইয়ে বলেছি। মানুষের জীবন-চর্চা ও চর্যার সমন্বিত রূপই মূলত সংস্কৃতি। সেই আলোকে বলা যেতে পারে, লোকসংস্কৃতিই বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারা। এই লোকসংস্কৃতির মর্মমূলেই আসলে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রোথিত। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান—এসবকিছুর সঙ্গেই লোকসংস্কৃতি জড়িয়ে আছে। আর জড়িয়ে আছে বলেই বাঙালি সমাজে এখন লোকসংস্কৃতি নিয়ে প্রবল আগ্রহ দেখা দিতে শুরু করেছে। আমরা লোকসংস্কৃতির কদর করতে শুরু করেছি। লোকসংস্কৃতিকে অন্তত আমি বাঙালির জীবন থেকে একেবারে অবিচ্ছেদ্য বা আলাদা কিছু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না।

এমনটি আপনার কেন মনে হলো? কারণ আমরা এখনও যে লোকসংস্কৃতিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছি এমন নয়।

আবুল আহসান চৌধুরী : সেটাই তো বললাম। ড. ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলার

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

বুক ইনফ্লুয়েন্সার কলাম

মুসাইয়িব বিন মুজিব

পুঁথি বাংলার অমূল্য রতন

দহিনালী হাবা ফিরিল ফাউন মাইস্যা দিন/শীয়ারে যাইতে আমির করিল একিন।

—অতঃপর ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে শিকারে রওনা হলো সওদাগর, সাথে উদ্দেশ্য, দেশে দেশে ঘুরে বাণিজ্য করা। সেই সাত ডিঙার আলাদা প্রকার, আলাদা আলাদা কাজ।

প্রথমে বাওয়াইল ডিঙা নামে মধুকর/সেই নাএ চলিল লক্ষের সদাগর/তার পাছে বাওয়াইল ডিঙা নামে বিজুসিজু/গাঙের দুই কূল ভাঙিয়া বেকা করে উজু/তার পাছে বাওয়াইল ডিঙা নামে গুয়ারেখী/যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি/তার পাছে বাওয়াইল ডিঙা নামে শখচূড়/সমুদ্রের দুকূল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মুড়।

—সাত ডিঙায় লগি-নোঙর, কামটা ধনু বন্দুক নেওয়া হলো, নেওয়া হলো ছয় মাসের খাবার। স্বামীকে একলা যেতে দিতে মন মানে না বধূ'র, 'তোমার সঙ্গেতে আমি হৈয়ম দেশান্তরী!' প্রবোধ জানায় সওদাগর। বলে—

কোথায় যাইবা তুমি ঘরের বউ/সাইগরের মাঝে আছে বড় বিষম ঢেউ/কিছু দিন থাক তুমি মন থির করি/জলদি ফিরিয়া আমি আসিব সোন্দরী।

ঘরে রইলো একলা স্ত্রী, শুরু তার অপেক্ষার পালা—

পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা/পাষাণে বান্ধিয়া দিল্ রহিলা একেলা।

আজ বানায় তালের পিঠা, কাল বানায় খৈ। শিকায় তুলে রাখে গামছা-বাঁধা দৈ। সালিধানের চিঁড়া কোটে, রাখে হাঁড়ি ভরে, ভালো ভালো মাছ আর মোরগের সালুন রাঁধে রোজ, এই বুঝি আজ ফিরলো স্বামী!

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

বিশেষ রচনা

হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি ঘাটুগান

তপন বাগচী

দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে সংস্কৃতি ও নান্দনিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার নিদর্শন বরাবরই লোকসাহিত্যে পাওয়া গেছে। লোকসাহিত্যের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের পার্থক্য রয়েছে। কারণ লোকসাহিত্যের কিছু ধরন রয়েছে, যেগুলো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হয়ে উঠেছিল। এগুলো গান, নাটকের আদলে এসেছে এবং অভিনীত হয়েছে। অঞ্চলভেদে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধরন দেখা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে গীতিকবিতার প্রাধান্য। কিছু কিছু লোকসাহিত্য চর্চার অভাবে হারিয়েও গেছে। এখন যতটুকু আছে তা ধারণা বা স্মৃতিচারণে।

বাংলাদেশ বলে পরিচিত ভূখণ্ডটিতে ঘাটুগান এমন এক লোকসাহিত্য। মূলত ঘাটে ঘাটে যে গান রচিত ও গাওয়া হয়—তাকেই ঘাটুগান বলা হয়। অঞ্চলভেদে এবং উচ্চারণভেদে একে 'ঘাঁটু', 'ঘেটু', 'ঘেঁটু', 'গেন্টু', 'ঘাড়ু', 'গাড়ু', 'গাঁটু', 'গাড়ু', 'গান্টু' গান নামেও ডাকা হয়। গুজরাটের গান্টুগানের সঙ্গে আমাদের ঘাটুগানের মিল রয়েছে। ঘাটুগানের প্রচলন দেখা যায় হাওরবেষ্টিত অঞ্চল, বিশেষ করে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন গ্রামে। সাধারণত ছোট ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে নাচের তালে এ গান গাওয়া হয়। হুমায়ূন আহমেদের 'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রে ঘেটুপুত্রদের বিষয়ে অনেকগুলো তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ঘাটু গান নিয়ে এখন অনেক গবেষকেরই আগ্রহ বেড়েছে। এটিও যে আমাদের লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য, তা অনেকেই অনুধাবন করছেন। কিন্তু এটি লিখিত সাহিত্যের মতো না হওয়ায় এর নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ-সংগ্রহ করা কঠিন। এ ঘাটুগানের প্রচলন যে ঠিক কবে আর কখন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। অনেকের মতে বৃহত্তর সিলেটের আজমিরীগঞ্জের উদয় আচার্য ছিলেন ঘাটু গানের প্রবর্তক। তখন ঘাটু গান গাওয়া হতো পূজা বা অর্চনার মতো একটি পবিত্র মাধ্যম হিসেবে। উদয় আচার্যের

এরপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান | **সম্পাদক :** আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা পর্ষদ : তৌহিদ ইমাম, আমিরুল আবেদিন আকাশ, রাশেদ সাদী, আরিফুল হাসান
অলংকরণ : লুৎফি রুনা, রাজীব রাজু, রাজীব দত্ত | **গ্রাফিক ডিজাইন :** সাইফুল সাগর, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদ মিজু

বেঙ্গলবুকস-কিন্ডারবুকস নিবেদিত একটি বইমেলা প্রকাশনা। প্রকাশক কর্তৃক নোভা টাওয়ার ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩ ● ইমেইল : info@kinderbooks.com.bd, info@bengalbooks.com.bd ● ওয়েব : www.kinderbooks.com.bd, www.bengalbooks.com.bd